Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য ও শিল্পচিন্তা

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ জামান খান
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.10
Pages	180-195
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য ও শিল্পচিন্তা

মোঃ জামান খান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক বিক্ষুব্ধ সময়ে এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০–১৯৫১) আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যে। লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার–এট্‌–ল ডিগ্রি লাভের পর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন–ব্যবসা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি বাল্য–অনুরাগ সত্ত্বেও বাংলায় লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর নিজের ভাষায় *সবুজপত্র* সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর উপদেশে প্রথম বাংলায় লিখতে শুরু করেন। ১৯১৯ সালে সবুজপত্রে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'অতীতের বোঝা' প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বহির্গত চাপই ক্রিয়াশীল ছিল। অথচ প্রথম লেখার এই ইতিহাসের সঙ্গে তার পরবর্তী লেখকজীবনের যোগ অতি সামান্যই। ক্রমশ তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের কর্ণধার। এবং ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আইনজীবী পরিচয়ের পরিবর্তে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টিই প্রধান হয়ে ওঠে।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের এই প্রাথমিক পর্বে স্বসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলি গভীরভাবে চিন্তা করেন। নিজ জ্ঞানসীমাকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি স্বসম্প্রদায়ের মঙ্গল-চিন্তায় ব্যাপৃত হন। তাঁর শিল্প ও সাহিত্যনীতিও এই গভীর অনুধ্যানের ফল এবং একই সাথে তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ধর্মভাবনা ও বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণচিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যকে এভাবে জীবনের সকল চাঞ্চল্যের সঙ্গে বিজড়িত করে ভেবেছেন বলেই এস. ওয়াজেদ আলির কাছে শিল্প হয়ে উঠেছে জীবনসাধনার নামান্তর। 'সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:

> "Art for Art's sake, কথাটা ঠিক নয়। কেননা আর্টের কারবার ভাবকে নিয়ে, আর ভাবের মূল্য নির্ভর করে তার বিষয়বস্তুর উপর। আমাদের বলা উচিত Art for

humanity's sake. অর্থাৎ মানুষ শিল্পের জন্য নয়, শিল্প হচ্ছে মানুষের জন্য কোন্ সাহিত্য প্রশংসনীয়, আর কোন্ সাহিত্য প্রশংসনীয় নয়, তার বিচার করবার আগে আমাদের স্থির করতে হবে, কোন্ জিনিসটা কাম্য, আর কোন্ জিনিসটা কাম্য নয়– মানুষেরজন্য. [সাহিত্য][১]

উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের আলোকে তাঁর এই নীতি পরিপুষ্ট বলে অনুমিত হয়। মানুষের প্রয়োজন তথা জীবনের প্রয়োজনের ব্যাপকতার সঙ্গে সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে যুক্ত করে দিলে তা মহৎ অভিব্যঞ্জন্যাকেই স্পষ্ট করে তোলে। আয়ত দৃষ্টির সাহায্যে আমরা অবশ্যই অবলোকন করতে সমর্থ হই সাহিত্যের সাধনা প্রকৃত অর্থে জীবনাদর্শের সাধনা। যে–সাহিত্যিকের জীবনবোধ অতি–উন্নত তাঁর রচিত সাহিত্যও তত উন্নত ও মহৎ। এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের ধর্মকে রিলিজয়নের সমার্থ বলে ভাবেন নি। তিনি সাহিত্যিকের নিকট সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহৎ জীবনভাবনাই দাবি করেছেন। আর সে–কারণে শিল্পের উদ্দেশ্য তাঁর নিকট আরও ব্যাপক ও জীবনের সামগ্রিক রূপসন্ধানী :

আর্টের জন্য আর্ট নয়; জীবনের অভিব্যক্তির জন্য, ভাবের অভিব্যক্তির জন্য, আদর্শের অভিব্যক্তির জন্য আর্ট। বর্তমান জগতে, বিশেষ করে, আমাদের এই বাংলাদেশে আর্টের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে যে একটা তুচ্ছতা, একটা Decadentism এসে দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে শিল্পী লেখাকে তার গৌণ উদ্দেশ্য মনে না করে তাকেই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি Art for Art's sake, এই ভ্রান্ত আদর্শের অনুবর্ত্তনকরেন।

আর্টের জন্য জীবন সাধনা করলে সাহিত্য হয় না। জীবন সাধনাকে রূপ দেবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করতে হয়, আর্টের সাধনা করতে হয়। লড়াইয়ের জন্য জীবন ধারণ করলে ভুল হয়, জীবন ধারণের জন্য লড়াই করতে হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তাই করেছেন। [সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা][২]

সুন্দর ও মহত্তের পরিকল্পনা ও সৃষ্টিই সাহিত্য ও শিল্পের মূলকথা। হৃদয়ের অনুভূতি চিন্তা ও আবেগ যার যত সুন্দর ও মহৎ, তাঁর সৃষ্টিকর্মও তত সুন্দর, মহৎ ও আবেদনবাহী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে, অন্তর দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসার মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রকৃত সাধক নিজ প্রাণধর্মকে শুচিস্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও উদার করতে সক্ষম হন, মনকে নানা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করতে সমর্থ হন। যিনি মহৎকে ভালবাসেন তাঁর আবেগ–অনুভূতিতেও তার প্রভাব হয়ে ওঠে অনিবার্য এবং সে কারণে তার রচনা মহৎগুণে গুণান্বিত হয়। এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের নিকট মহৎকে ভালবাসা মহৎ চিন্তা করা এবং মহৎ সৃষ্টিরই আবেদন রাখেন। সাহিত্যিকের সাধনার সার্থকতাও যে এই পথেই সম্ভব সে ব্যাপারেও তিনি সন্দেহাতীত। তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে সত্য–

সুন্দরের সাধনায় ব্যাপৃত থাকা, সীমা থেকে অসীমে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ক্রমশ ক্ষুদ্র তেকে ব্যাপকতার মধ্যে অবগাহনই সিদ্ধির শর্ত। এস· ওয়াজেদ আলির ভাষায় :

> আমাদের সাহিত্য সাধনা সাথক করতে হলে শ্রেয়ের সন্ধানে, সত্যের সন্ধানে, সুন্দরের সন্ধানে আমাদের অভিযান করতে হবে. সে অভিযান যিনি যত আগ্রহের সঙ্গে, যিনি যত নিষ্ঠার সঙ্গে করবেন, সাহিত্য সাধনা তার তত সার্থক হবে: জীবনে তুচ্ছতাকে যিনি যত বর্জ্জন করতে পারবেন, সাহিত্য তাঁর ততই তুচ্ছতা বর্জ্জিত হবে· সাময়িক উত্তেজনা ছেড়ে যিনি যত শাশ্বতের দিকে, চিরন্তনের দিকে, যেতে পারবেন, তার সৃষ্ট সাহিত্য ততই শাশ্বত, ততই চিরন্তন হবে। পথের আমাদের শেষ নাই, সৃষ্টি সাধনারও আমাদের শেষ নাই: অনন্ত পথের যাত্রী আমরা, অন্তহীন আমাদের সম্ভাবনা: সেই অনন্ত পথের খানিকটা মাত্র এ-জীবনে আমরা সাধিত করতে পারবো, আর সেই অনন্ত সম্ভাবনার খানিকটা মাত্র এ-জীবনে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। তবে সেই খানিকটা ও যদি করতে পারি, জীবন তাহলে আমাদের ব্যর্থ হবে না। [সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা][৩]

সাহিত্যের সত্য-সুন্দর-কল্যাণ অভিমুখী অভিযানের কথা বলতে বলতেই তিনি জীবনের গভীরতর অস্তিত্ব-উপলব্ধির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন। মানবজাতির, মানব সভ্যতার অন্তহীন পথযাত্রায় ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব একান্তই ক্ষণিকের— জীবনের এই সুগভীর মর্মের কথা যদি আমরা বিস্মৃত না হই তাহলেই আমাদের শিল্প সাধনা ক্ষুদ্রকে বর্জন করে মহত্তরকে আপন বলে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে।— এই হলো এস. ওয়াজেদ আলি'র বিশ্বাস। সে কারণেই তিনি সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য আলোচনার সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে বারবার বিজড়িত করে ফেলেন। তিনি আরও বলেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েই শিল্পীর উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায় না, মহত্ত্বের দিকেও তাকে দৃষ্টি দিতে হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টি প্রেরণা তাই দুই উদ্দেশ্য নিবেদিত : এক. সুন্দর, দুই মহত্ত্ব। এই সূত্রেই এস. ওয়াজেদ আলি শিল্পের দুটি শ্রেণী বিভাগের কথাও বলেন। এক. বাস্তবতামূলক শিল্প, দুই. আদর্শমূলক শিল্প। তাঁর মতে, বাস্তবতামূলক শিল্প জীবনকে বাস্তবরূপে উপস্থাপন করে আর আদর্শমূলক শিল্প শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে পরিস্ফুটিত করে তাঁর আদর্শকে। এস. ওয়াজেদ আলি এই আদর্শমূলক শিল্পকেই জীবন-শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, যে-শিল্পে সাহিত্যিকের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্প সর্বাংশে ও সর্বত্র সত্য ও শ্রেয়কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়। ফলে জীবনশিল্প ও আদর্শমূলক শিল্পের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। জীবনশিল্পীর কর্তব্যকে তাই তিনি অনেক বড়ো করে ভাবেন :

> জীবন-শিল্পী তাঁর বেষ্টনীর মধ্যে অন্তরের প্রেরণাকে মূর্ত্ত ক'রে তোলবার চেষ্টায় সতত ব্যস্ত

থাকেন। কেবল নিজের জীবনকে সত্য, মহৎ এবং সুন্দর ক'রে তিনি সন্তুষ্ট হন না। পরন্তু, তাঁর বেষ্টনীর সকলের জীবনেই এই আদর্শত্রয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ তিনি কাজ করে যান। তাঁর ব্যাপক অন্তরে কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন সংকীর্ণ উদ্দেশ্য স্থান পায় না। নীতি-দর্শনের বিভিন্ন আদর্শের সত্যাংশ তিনি গ্রহণ করেন এবং অসত্যাংশ বর্জ্জন করেন। সৃষ্টিই হ'চ্ছে তাঁর আদর্শ, সুতরাং বিশ্বকর্ম্মারই মত, জীবনে যা কিছু সত্য, যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর তিনি দেখতে পান, সে সমস্তকেই তাঁর সৃষ্ট শিল্পে সংযোজিত ক'রতে তিনি যত্নবান হন। তাঁর ব্যাপক, শান্ত এবং সুগভীর প্রাণে বিভিন্ন নীতির বিরোধ দূরীভূত হয়, আর তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শে বিভিন্ন আদর্শের নিত্য নূতন সমন্বয়ে বিশ্ব সম্পদশালী হ'য়ে ওঠে। [জীবনের শিল্প][৪]

সাহিত্য-শিল্পীর সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার, সৃষ্টিগত প্রেরণার দিক থেকে, অভিন্নতা খুঁজে পেয়েছেনএস. ওয়াজেদ আলি। গুপ্তরত্নবিশেষ স্রষ্টা যেমন নিজেকে প্রকাশ করা বা জানাবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন তেমনি শিল্পীও তাঁর অন্তরের প্রেরণাকে বাহ্যিক রূপদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি সাধনায় ব্যাপৃত হন। উভয়ের এই অভিন্নতাই উভয়কে করে তোলে মহৎ, উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

২

এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে সর্বদা মানবমুখী করার কথাই ভেবেছেন। মানবকল্যাণ ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে— এ তিনি বিশ্বাস করেন না। সমাজের জন্য বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর— এমন সাহিত্য রচনা থেকে বিরত থাকাকেই তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট :

সাহিত্যের লক্ষ্য কি? সাহিত্যিকেরই বা আদর্শ কি? প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা রসের সৃষ্টিকেই সাহিত্যের লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। সাহিত্যিকের কাজ সে হিসাবে হল রসের সৃষ্টি ও তার পরিবেশন। তবে রস বিভিন্ন রকমের হয়, আর বিভিন্ন রসের পরিবেশনে বিভিন্ন ফল সমাজে দেখা দেয়। যে রসের ফল অনিষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে রসের পরিবেশন আমরা সমর্থন করতে পারি না; পক্ষান্তরে, যে রস থেকে আসে বিমল আনন্দ, উচ্চ আদর্শের প্রেরণা, কল্যাণপ্রসূ চিন্তাধারা, সেই রসের পরিবশেনেই হল সাহিত্যিকের প্রকৃত কাজ। [সাহিত্যের লক্ষ্য][৫]

মানবহিতকেই তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য হিসেবে সামনে রাখছেন। প্রসঙ্গত তিনি সাহিত্যিকের কাঁধে চাপিয়েছেন আরও অনেক দায়িত্ব। তাঁর মতে, সাহিত্যিককে যেমন তাঁর নিজ সমাজের মানুষের মনকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তেমনি তাঁকে হতে হবে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাও। এ-দুটি বিষয়ে কোনো সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় দিলে তাঁর সাধনাও নিঃসন্দেহে সার্থক হয়ে উঠবে।

আর এই সমগ্র বিষয়টিতে এস. ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি সমাজকল্যাণের প্রতি নিবিষ্ট:

> সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে বেষ্টনীর দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য– সৃষ্টি করা, আর মানুষের মনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সে–সাহিত্যকে রূপায়িত করা, অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যৎ জগতের সুস্পষ্ট ছবি দেখা, আর তুলিকার সাহায্যে সেই ছবিকে মনোহর রূপ দান করা। এই পথে চললেই সাহিত্যিকের সাধনা প্রকৃত সার্থকতা লাভ করবে তবেই সমাজকে তিনি মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারবেন আজকালকার এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে গতানুগতিকভাবে পথ হচ্ছে ব্যর্থতার পথ, মৃত্যুর পথ যে সাহিত্যিক ব্যর্থতা এড়াতে চান, মরণজয়ী সাধনা করতে চান, তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নব সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে [সাহিত্যের লক্ষ্য][৬]

সাহিত্যিককে যুগের দাবি ও চাহিদার প্রতি অবশ্যই তাঁর শিল্পীসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যুগের মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধিও আবশ্যকীয়। এবং এক্ষেত্রে যুগের মন, তার গতিপ্রকৃতি, তার ভাববিহ্বলতা— এই সবকিছুকে অনুধাবন করতে হবে অতি নিবিড়ভাবে। কেননা, এস· ওয়াজেদ আলি মনে করেন, ক্ষণিকের ভাবোচ্ছ্বাস বা সৃষ্টিচঞ্চলতা দ্বারা সাহিত্যিক সার্থক হতে পারেন না— শিল্প সিদ্ধির জন্য তাঁকে হতে হয় সাধকের মতো ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ধ্যানগম্ভীর ও স্থির প্রাজ্ঞ :

> সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। পরের ধর্ম অবলম্বন করে খুঁড়িয়ে বাঁচার চেয়ে স্বধর্মে ধীরের মত মরাও ভাল। সাহিত্য হলো বড় রকমের একটা সাধনা। এ সাধনা সার্থক করতে হলে সাহিত্যিককে দলাদলির উর্ধ্বে উঠতে হবে; সত্য, শ্রেয়, সুন্দরের অনাবৃত রূপ দেখতে হবে; অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথাযোগ্য দাবীর সুবিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে; সমগ্র জাতি আর মানবতার কল্যাণের পথ নির্মল অন্তরের নির্দেশে খুঁজে বের করতে হবে; আর সার্থক তুলিকার সাহায্যে সে পথকে বিচিত্র রং–এ সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে। [সাহিত্যের লক্ষ্য][৭]

সাহিত্যিক যদি তাঁর অনুভূতি প্রকাশের অন্তর্তাগিদকে সাধকসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করেন তাহলে ভাষাভঙ্গি, মনোভঙ্গি প্রভৃতি সবদিক থেকেই তিনি হয়ে উঠবেন নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্রপরায়ণ। সাহিত্যিকের এই স্বাতন্ত্র্যচেতনাই উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁকে করে তোলে যুগোপযোগী এবং সমকাল-সংলগ্ন।সভ্যতার অগ্রসরতা ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপকরণও যে রূপান্তরিত হয়— সে বিষয়টিও এস. ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি এড়ায়নি। জীবন বহমান;— সে-কারণে মানবসভ্যতা, মানবীয় মূল্যবোধ, সমাজবৈশিষ্ট্য নিয়ত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানবজীবনের রূপকার শিল্পীকেও তাই পরিবর্তনশীল-তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেই সাহিত্য নির্মাণ করতে হয়। সাহিত্যের উপকরণ

সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলির বক্তব্যে তাই ইতিহাসবোধ নিবিড় হয়ে ওঠে :

> প্রাচীনকালে সমাজ বলতে বোঝা যেতো, রাজা, মহারাজা, বাদশা, নবাব প্রভৃতি উচ্চস্তরের শাসকশ্রেণী। তখন এঁদের নিয়েই সাহিত্য রচিত হত, আর সেই সাহিত্যই আপামর সকলকে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করতো। তারপর ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচিত হল। মানুষ সেই সাহিত্য থেকেই আনন্দ এবং শিক্ষা আহরণ করতে লাগলো। বিগত অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্য সাধারণতঃ এই শ্রেণীরই সাহিত্য। ইউরোপের প্রভাব ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশেও এসে দেখা দিল। গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নেয়েই রচিত হয়েছিল। দরিদ্র জনসাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর কৃষক-মজুর প্রভৃতির স্থান সে সাহিত্যে ছিল না বললেই চলে। এই শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকাহিনীমূলক সাহিত্যই পড়তো আর তা থেকেই তারা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতো। [সাহিত্যের লক্ষ্য][৮]

এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যচিন্তায় সর্বত্রই ইতিহাসদৃষ্টির গভীরতা সহজলভ্য। যে-কারণেই তিনি সাহিত্যিকের ঐকান্তিক সাধনার সঙ্গে জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নটিকে যথার্থভাবেই জড়িত করে ফেলেন। তাঁর মতে, মানবপ্রেমের এক মহান আদর্শ হ'বে সাহিত্যিকের চলার পথের পাথেয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্যসাধন করে সমগ্র জাতিকে একটি সমন্বিত কল্যাণপথে চালিত করা সাহিত্যিকের কর্তব্য। একটি জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ওই জাতির শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকাই মুখ্য। সম্পূর্ণভাবে দলনিরপেক্ষ ও সম্প্রদায়-উর্ধ্ব মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে একজন সাহিত্যিক জাতিগঠনের ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখবেন— যাতে আধুনিক যুগে মানুষ তাঁকে মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রচারকদের মতোই শ্রদ্ধা করে। এ যুগের সাহিত্যিকগণকে এই গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> প্রাচীনকালে ধর্ম প্রচারকেরা মানুষকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, পরিচালিত করতেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দায়িত্ব সাহিত্যিকদের স্কন্ধে এসে পড়েছে। পূর্বে যে প্রেরণা মানুষ ধর্ম প্রচারকদের কাছ থেকে পেতে, এখন সে প্রেরণা সে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পায়। সাহিত্যের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে সাহিত্যিকের দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে। ধর্ম প্রচারকেরা বিশেষ কোন ধর্মকে অবলম্বন করেই প্রচারকার্য চালাতেন, সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা প্রচার চালান সার্বজনীন রসধর্মকে আশ্রয় করে। সাহিত্যিক রূপকার, তাঁরা ভাবুক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙক্ষাকে মানুষের অন্তরের অন্তর্গূঢ় প্রেরণাকে রূপদান করাই তাঁদের কাজ। সুতরাং মানবতার ধর্মই সাহিত্যিকের স্বাভাবিক ধর্ম। এই মানবিক ধর্ম ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রেখে সাধনা করলে, সাহিত্যিকেরা অবধারিত উদীয়মান জাতির এক মঙ্গলময় জীবনবেদী রচনা করতে পারবেন, এ আমার নিঃসংশয় প্রত্যয়। [সাহিত্যের লক্ষ্য][৯]

সাহিত্যিককে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। মানুষের মুক্তিপিপাসার আর্তিকে যদি তিনি তাঁর রচনায় শিল্পরূপ দিতে চান তাহলে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অবশ্যই তাকে একাত্ম হতে হবে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মন যদি সম্প্রদায় ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয় দৃষ্টি যদি হয় আচ্ছন্ন, তাহলে নিশ্চিতভাবে সামগ্রিক জাতিচিন্তা থেকে তিনি পিছিয়ে পড়বেন এবং স্বাভাবিকভাবে জাতির স্বাধীন বিকাশের প্রশ্নটিকেও তিনি বড়ো করে দেখতে সক্ষম হবেন না। অতএব একজন সার্থক সাহিত্যিককে অবশ্যই সম্প্রাদায়-মানসিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে জাতিভাবনাকে। সেজন্য দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধের বিষয়টিও সাহিত্যিকের জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানবকল্যাণমুখী সাহিত্যের প্রবক্তা এস. ওয়াজেদ আলি ভারতবর্ষের সাহিত্য থেকে উদাহরণ উপস্থাপন করে দেখান যে সম্প্রদায়প্রীতি কিভাবে একজন মুসলিম সাহিত্যিককে দেশপ্রেমভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে. এবং পরিণতিতে তিনি সার্থকতার চূড়াস্পর্শ করতে অসফল হন। এস. ওয়াজেদ আলির ভাষায় :

> সাহিত্যিক হল জাতির পথ-প্রদর্শক— তার জীবন্ত জীবনের মুখপত্র এবং প্রতীক। সাহিত্যিক যখন মুক্তির বাণী প্রচার করে, তখনই তার লেখা থেকে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তার কথায় বৈদ্যুতিক শক্তি দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতকে দুইজন ভারতীয় Sir Walter Scott অনুসৃত পথ অবলম্বন করে সাহিত্য-সাধনা করেন। তাঁদের একজন হলেন বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর একজন হলেন উর্দূ সাহিত্যিক আব্দুল হালিম শারর। প্রতিভা এবং সৃষ্টির দিক থেকে, শারর বঙ্কিমের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নন। পক্ষান্তরে শাররের লেখার মধ্যে যে উদারতা এবং সার্বভৌমিকতা পাওয়া যায়, বঙ্কিমের লেখায় তার অভাব একান্তভাবেই অনুভূত হয়। অথচ শাররের লেখার চেয়ে বঙ্কিমের লেখা দেশের জীবনে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও করছে এর কারণ হচ্ছে, বঙ্কিম ইংরাজী সাহিত্য থেকে Patriotism দেশ-প্রেম জিনিসটাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেছিলেন, আর শারর তা করেন নি। [সাহিত্য][১০]

শাররের সাহিত্যে দেশপ্রেমের কেন অভাব তার কারণও অবশ্য এস. ওয়াজেদ আলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিস্থিতিই এর কারণ। যে-অঞ্চলে তাঁর বাস ওই অঞ্চলে শতকরা দশভাগের মতো লোক মুসলমান-ফলে মুসলমানরা হিন্দু বিদ্বেষ থেকে দেশপ্রেমে অগ্রসর হয়ে দেশশাসনের ভার হিন্দুদের ওপর ছেড়ে দিতে অনাগ্রহী। মুসলমানদের এই সংকীর্ণ সম্প্রদায়বিদ্বেষ লেখক শাররকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে তাঁর সাহিত্যে দেশপ্রেমের অভাব। যে-সময়ের উদাহরণ এস. ওয়াজেদ আলি উপস্থাপন করছেন, সে-সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিম সাহিত্যিকগণ উপরি-উক্ত কারণে দেশপ্রেমের প্রশ্নে ছিলেন দ্বিধান্বিত।

অথচ রেনেসাঁসের এক পরিপক্ক ফল হলো স্বাজাত্যবোধ এবং তা আধুনিকতারও নামান্তর। প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী একজন সাহিত্যিক, তিনি যে-অঞ্চলেরই হোন না কেন, সেই দেশপ্রেমকে সংকীর্ণ সম্প্রদায় মানসিকতা দ্বারা উপেক্ষা করলে তার পরিণতি শুভ হয় না। কবি ইকবাল এই সীমাবদ্ধতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এমন আদর্শ প্রচার করেন, এস. ওয়াজেদ আলির মতে, যা এক ভুল থেকে আরেক ভুলের গহ্বরে তাঁকে নিক্ষেপ করে। ইকবাল যে বিশ্বমুসলিম রাষ্ট্রাদর্শের প্রচার করেন তা এ-যুগের পটভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। ফলে সেক্ষেত্রেও দেখা দেয় অসফলতা। এ সকল উদাহরণ সহযোগে এস. ওয়াজেদ আলি দেখাতে চান যে এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকগণকে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যুগোপযোগী চেতনার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করতে হবে, অন্যথায় সার্থকতার চূড়াস্পর্শ সম্ভবপর নয়। এ-প্রসঙ্গেই তিনি ভারতবর্ষের মুসলিম সাহিত্যিকগণকে জাতীয় রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যচিন্তা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত :

> সাহিত্যিক জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং স্বার্থ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে পারে না। সেই জন্য সাহিত্যিক হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, স্বাধীন বঙ্গের আদর্শ সম্মুখে রেখেই ভবিষ্যতে আমাদের দেশ-প্রেমের গান গাইতে হবে, দেশ-প্রেমিকের ছবি আঁকতে হবে, দেশ-সেবার কল্পনা-জল্পনা করতে হবে। চিন্তার, কল্পনার, সেবার এবং সাধনার যে বিরাট এক জগৎ এখন আমাদের কাছে বন্ধ আছে, বাঙালীত্বের মনোমুগ্ধকর যাদু-স্পর্শে তার দুয়ার খুলে যাবে। – সকলে যাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার অনুকূল ব্যবস্থা করতে হবে, আর সাহিত্যিকদের সেদিকে লক্ষ্য রেখে সহিত্য-সাধনা করতে হবে।' [সাহিত্য][১১]

স্বাধীন বঙ্গের এই আদর্শ অর্থাৎ বাঙালীত্ব বা বাঙালীকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার এই আদর্শই, এস. ওয়াজেদ আলির মতে, একজন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের দেশপ্রেমের প্রশ্নে সবচেয়ে উচ্চতর, সহজতর ও কাম্যতর। এ প্রশ্নে তিনি অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধী। স্মরণীয়, এ প্রবন্ধটি তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতির ভাষণ হিসেবে পাঠ করেন ১৯৩৯ সালে। তখনও লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর এই চিন্তা কত প্রাগ্রসর ও পরিণামসঞ্চারী তা সহজেই বোধগম্য। তাছাড়া এই আদর্শের মধ্যে তাঁর সম্প্রদায়নিরপেক্ষ উদার মানসিকতাও গভীরভাবে ব্যক্ত হয়। বাংলাভাষী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের ঐকান্তিক নিবিড় বন্ধুত্ব তিনি কামনা করেন, কামনা করেন মনের উচ্চতা ও ঔদার্য। তবে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা কোনোভাবেই ধর্মকে উপেক্ষা

বা বিরোধিতা নয়। তিনি বলেন :

> মানুষের যেমন রাষ্ট্র না হলে চলে না, তেমনি ধর্ম্ম না হলেও চলে না. ধর্ম্মের প্রয়োজন রাষ্ট্রের চেয়েও গভীরতর. কেননা, রাষ্ট্রের কারবার হল মানুষের নশ্বর জীবনকে নিয়ে, আর ধর্ম্মের কারবার হল, তার অবিনশ্বর জীবনকে নিয়ে, তার চিরন্তন আত্মাকে নিয়ে; রাষ্ট্রের কারবার হল মানুষকে আর মানুষের সমষ্টিকে নিয়ে; আর ধর্ম্মের কারবার হল, মানুষের স্রষ্টাকে, অব্যয়-অক্ষয় সত্যকে নিয়ে. সাহিত্যিকের প্রকৃত কারবার হল, মানুষের অমর আত্মাকে নিয়ে: সুতরাং সাহিত্য থেকে, সাহিত্যের আলোচনা থেকে, ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া যায় না। [সাহিত্য][১২]

এভাবে রাষ্ট্র, ধর্ম ও সাহিত্যের এক নিবিড় সম্পর্ককে আবিষ্কার করেন এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর এই আবিষ্কারের পেছনে দুটি যুক্তি ক্রিয়াশিল থাকে : এক. সমাজকল্যাণ; দুই. বাস্তবতাবোধ। তাঁর নিজের ধর্মপ্রাণতা ছাড়াও তাঁর বাস্তবতাবোধের সঙ্গে ধর্ম যুক্ত হয়ে যায় এইভাবে যে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ। সাহিত্যসৃষ্টি তাদের বাদ দিয়ে হতে পারে না। তিনি সবসময়ই স্মরণ রাখেন যে, সাহিত্যিকের একমাত্র অন্বিষ্ট মানবজীবন; এবং তিনি এ-ও মনে করেন যে মানবজীবনের লক্ষ্য অবশ্যই ভাল কাজ, ভাল চিন্তা, ভাল আদর্শ। এই ভালোত্বের সঙ্গে ধর্মেরও একটা সম্পর্ক আছে। সকল ধর্মের সকল আচরণবিধির লক্ষ্যই মানবকল্যাণ। মানুষের জীবন যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে লালিত ও বর্ধিত হয় সেই বেষ্টনীর প্রতি সাহিত্যিকের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অবশ্যই জরুরি। এস. ওয়াজেদ আলির বক্তব্য, এ-সম্পর্কে, অত্যন্ত স্পষ্ট :

> সাহিত্য গড়তে হলে, প্রথম দেখতে হবে, কাদের জন্য সাহিত্য গড়া হচ্ছে, তাদের দেশ কিরূপ, তাদের সমাজ কিরূপ, তাদের কালচার কিরূপ, তাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাদের বেষ্টনী কিরূপ, তাদের আদর্শ কিরূপ ইত্যাদি। বাগানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর মানবতার সৃষ্টি করা. মালীকে বাগানের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে, ভাল ফুল এবং ভাল ফল সৃষ্টির চেষ্টা করতে হয়; সাহিত্যিককে সমাজের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে, উচ্চতর মানবতার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে হবে [সাহিত্য][১৩]

সাহিত্যিককে এরূপ দায়িত্বপালন করতে হলে কেবল সমাজজীবনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলেই চলে না। সমাজ-অভ্যন্তরের নানা ক্লেদ, গ্লানি, নানা অনাচার-কুআচার, নানা দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক বিরামহীন সংগ্রামও তাঁকে চালাতে হয়। বৈষম্যজর্জর, ঔপনিবেশিক শক্তিশাসিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটি সমাজে সৎ জীবনযাপন কিংবা সৎসৃষ্টির কাজটি কখনও অনায়াসসাধ্য বা বিঘ্নমুক্ত নয়। পদে পদে বিভিন্ন বাধা তাকে অতিক্রম করতে হয়। একটি বড় বাধা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার। প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে নতুন চিন্তা নতুন দৃষ্টি সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে সবসময় বাধাগ্রস্ত করে

পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল মানসিকতা। সুতরাং সমাজে পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত সাহিত্যিককে এসবের বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রাচীনপন্থা ও প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব পরিচালনা করতে হয় :

> ভাল সাহিত্য গড়তে হলে, সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়তে হলে, সমাজ-জীবনেরও পাট করার প্রয়োজন যে সব সংস্কার, যে সব সামাজিক ব্যবস্থা, যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, সে সবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, সে সবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে হবে, সে সবের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে [সাহিত্য][১৪]

মানবকল্যাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাংলাভাষী এই অঞ্চলে কী কী বাধা রয়েছে তারও একটি বিবরণ দিয়েছেন এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর মতে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে হীনতাসূচক মনোবৃত্তি এমন গভীরভাবে মূলীভূত হয়ে আছে যে তা বাঙালির উন্নতি বা বিকাশের পথে এক কঠিনতর বাধা। সাহিত্যিককে এই মানসিকতা দূর করার ব্যাপারে গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে তৎপর হতে হবে। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কী, হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক না কি ইওরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে— এ ব্যাপারেও সাহিত্যিককে হতে হবে সজাগ। তাছাড়া এদেশের দারিদ্র্যময় জীবন— কিভাবে তার উৎপত্তি, কিভাবে তা বিদূরিত হতে পারে— এসবও সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হবে— সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের কাছ থেকে দাবি করেন অতিশয় জীবনঘনিষ্ঠ মানসিকতার। জীবনের সকল প্রান্ত— তার ধর্ম, তার সংস্কৃতি, তার জাতিসত্তা, তার প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সবকিছু —সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট হবে। তাহলেই একজনের পক্ষে সততার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে মানবের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন সম্ভবপর হবে।

৩

ভাষা প্রশ্নেও তাঁর এই বাস্তববুদ্ধি ও কল্যাণচেতনার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। ব্রিটিসশাসিত ভারতীয় বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এক জাতিসত্তার অধীন, উভয় সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পাশাপাশি একথাও ঠিক, ধর্মীয় কারণে, এই দুই সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মিক সম্পর্ক এই ভিন্নতার সূচনা করেছে। বাংলা মাতৃভাষার উত্তরাধিকার সত্ত্বেও এই

ভিন্নতার বিষয়টিও গুরুত্বহীন নয়। এস. ওয়াজেদ আলি এই উভয় বাস্তবতাকে স্বীকার করে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। সে কারণে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের ভাষা সম্পর্কিত এই বাস্তবতাকে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে :

> বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গলাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হবে। তবে একথা ভুললেও চলবে না যে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু সমাজের অঙ্কেই প্রতিপালিত হয়েছে, এবং হিন্দুধর্মের মানসিক এবং নৈতিক অমৃতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। আমাদের ধর্মের এবং সমাজের উপযোগী করবার জন্য এ ভাষাকে আমাদের দরকার মত অনেকটা গড়ে পিটে নিতে হবে। এখন থেকে এ বিষয়ে Theorise করে কিন্তু বিশেষ কোন লাভ নাই। ভাষার ভবিষ্যৎ তার্কিকের তর্কের উপর নির্ভর করবে না, সাহিত্যিকের সাধনার উপরেই নির্ভর করবে। আমি কেবল আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে ভাষাকে যে জাতীয় ছাঁচে চালবার দরকার আছে, সে কথা আপনারা ভুলবেন না। আর এই মূল কথাটি মনে রেখে যদি আপনারা আপনাদের সাহিত্যিক Instinct-এর অনুসরণ করেন তা হলেই যথেষ্ট হবে। [মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য][১৫]

বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে বাঙালি মুসলমান সাহিতিক্যদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে। ১৯২৫ সালে যখন তিনি উপরি-উক্ত প্রবন্ধটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন, তখন পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিকদের ওই ভাষা গড়ে ওঠেনি। তিনি ওই ভাষার অভাব বোধ করছেন এবং সে-কারণেই তা সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রতি। মুসলমান সাহিত্যিকদের ব্যবহারের জন্য ভাষার একটি জাতীয় কাঠামো বিনর্মাণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন। স্মরণীয় যে, এক্ষত্রে তিনি মোটেই সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার দ্বারা চালিত হন নি। তিনি মোটেই ভুলে যান না যে তিনি বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। তবে ভাষার প্রশ্নে, বিশেষত সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষার প্রশ্নে, এস. ওয়াজেদ আলির চিন্তাসূত্র আরও গভীরে প্রোথিত। এক্ষেত্রেও তিনি জনতার বোধগম্যতা ও জনতার কল্যাণাদর্শের প্রশ্নটিকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্যিকের ভাষা হবে সহজ, সরল ও ব্যাপক— জনগণের নিকট সুখপাঠ্য :

> আজকাল হিন্দু লেখকেরা সংস্কৃতবহুল সমাসাদিপূর্ণ পদের ব্যবহার ত্যাগ করে সোজাসুজি চলিত বাঙ্গলাতেই সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। আমাদের সাধারণ মুসলমান লেখকরা কিন্তু ভাষাকে জটিল করে তোলাকে এই Democratic যুগেও সাহিত্যশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন। এই কুনীতির অনুসরণ করাতে তাঁদের অনেকের লেখার মধ্যে, একটা প্রাণীহীন আড়ষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়, যা সাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই মারাত্মক। আশা

করি তাঁরা শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের অনুসরণ করে ভাষাকে যতদূর সম্ভব সরল এবং স্বচ্ছ করে তুলবার চেষ্টা করবেন এতে তাদের ভাবের মধ্যে প্রাঞ্জলতা আসবে, আর তাঁদের ভাষায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটে উঠবে [মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য]।[১৬]

এস. ওয়াজেদ আলি এভাবে স্পষ্টই মত ব্যক্ত করেন যে, ভাষাকে অহেতুক জটিল করে তোলা সুনীতির পরিচয় নয়, বরং তাতে ভাষা নিষ্প্রাণ ও গতিহীন হয়ে পড়ে। ভাষাকে সজীব, প্রাণবন্ত ও গতিময় করে তুলতে হলে অবশ্যই সহজ-সরল-প্রাঞ্জলতার আশ্রয় নিতে হবে। এই ভাষার প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি সমস্যার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎকালীন সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত পুরুষ, আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল এবং নানা কারণে সমাজে নেতৃস্থানীয় তাদের ভাষা এবং সাধারণ মানুষের ভাষা এক ছিল না। উভয়ের ভাষা উভয়ের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। ভাষা প্রশ্নে সমাজের একই সম্প্রদায়ভুক্ত দুটি অংশের মধ্যে এই যে ব্যবধান তা ওই সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না— এটাই এস. ওয়াজেদ আলির মত। এবং তিনি এক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে সাধারণ মানুষের নিকট ব্যাপকভাবে সহজবোধ্য ভাষার চর্চার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সমাজভাবনাকে বিজরিত করা এস. ওয়াজেদ আলির একটি বৈশিষ্ট্য এবং তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাঙালি মুসলমান সমাজের তৎকালীন ভাষা-সমস্যাটিকে তিনি তুলে ধরেন এভাবে :

আমাদের নেতারা বাঙ্গলা জানেন না; আর সাধারণ মুসলমানেরা উর্দ্দু কি ইংরেজি জানে না। তাঁরা যা বলেন সাধারণ লোকে তা বুঝে না এবং সাধারণ লোকে যা বলে বা ভাবে তাঁরা তা বুঝেন না তাঁদের মধ্যে আর সাধারণ মুসলমান সমাজের মধ্যে ভাবের বিনিময় নাই; কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই ফলে আমাদের নেতারা আজ ফৌজহীন সর্দ্দার হয়ে দাঁড়িয়েছেন; আর আমাদের জনসাধারণ সর্দ্দারহীন ফৌজে পরিণত হয়েছে এরূপ সমাজের ভবিষ্যৎ যে বিপদ সঙ্কুল তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে?

এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের ছোট বড় সকলকেই মনোযোগের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করতে হবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর করতে হবে আর সংবাদপত্রের প্রচলনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে লাগতে হবে এই নীতির অনুসরণ করলে আমাদের সাহিত্যিকরাও উৎসাহিত হবেন, আর তখন তাঁদের আবেগময় চেষ্টায় আমাদের সমাজ অল্প কালের মধ্যেই সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে [মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য]।[১৭]

সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজের মঙ্গলের জন্য বিকাশের জন্য যখন তিনি বাংলা ভাষা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন, তখনও তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের পার্থক্যের বিষয়টি ভুলে যান না। এই দুই সাহিত্যিক সম্প্রদায় একই ভাষা-

সাহিত্যের উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ধর্মগত এতিহ্যের কারণে দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার ক্ষেত্রে যে তারতম্য ঘটেছে— সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে সেই বাস্তবতাকে তিনি অস্বীকার করতে চান না। বাঙালি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত কোনো সাহিত্যিক যদি নিজ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুসারী হতে আগ্রহী হন, তার প্রতি এস. ওয়াজেদ আলি বরং বিরূপতা প্রকাশ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন তিনি এ-প্রবন্ধ রচনা করছেন সে সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদেরই প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ফলে মুসলমানদের মধ্যে যারা সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে তারা হিন্দুদের রচিত সাহিত্যই উদাহরণ হিসেবে সামনে পেয়েছে; এবং সংস্কৃতপ্রধান ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে। তাদের নিজ পরিবার ও সমাজ পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত আরবি–ফারসি মিশ্রিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে কুণ্ঠাবোধ করেছে। এখানেই এস. ওয়াজেদ আলির আপত্তি। সাহিত্যে আরবি–ফারসি–উরদু শব্দের প্রয়োগের ব্যাপারে, এস. ওয়াজেদ আলির মতে, অনেক বিশুদ্ধতাপন্থী মুসলমান সাহিত্যিকদের চেয়ে প্রতিভাবান হিন্দু সাহিত্যিকরাই অধিকতর উদার। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

> হিন্দুর ব্যবহৃত সংস্কৃতমূলক শব্দ যদি আমাদের সাহিত্যে অবাধে চলতে পারে, তাহলে আমাদের ব্যবহৃত আরবী, ফার্সিমূলক শব্দ যে কেন চলবে না, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমি তো খুঁজে পাই না মুসলমানদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ছাড়া তাদের মনের ভাব যথোচিতভাবে ব্যক্ত করা যায় না ভাবের প্রকাশ যদি সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহলে মুসলমানদের ভাব প্রকাশের জন্য তার স্বাভাবিক ভাষা সাহিত্যে যতটা আনতে পারা যায়, সাহিত্যের এবং ভাষার পক্ষে ততই মঙ্গল. [বাঙ্গালী মুস্লমানের সাহিত্য সমস্যা][১৮]

বাংলা সাহিত্যে আরবি–ফার্সি শব্দ ব্যবহারের প্রশ্নে এস. ওয়াজেদ আলির এই মনোভাবের মধ্যে সংকীর্ণতা বা রক্ষণশীলতা নেই। বরং তিনি এক্ষেত্রেও বাস্তবতা অনুসরণের পক্ষপাতী। বাস্তববুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে তিনি স্বীকার করেন যে সাহিত্যের বাহন হবে কথ্যভাষা এক্ষেত্রে তার যুক্তিটি ইতিহাস–পরিসুত। যেমন, তিনি বলেন যে, কথ্য ভাষা থেকেই লিখিত ভাষার উৎপত্তি। সাহিত্যকে সবসময় কথ্যভাষা-সংশ্লিষ্ট থাকতে হয় বলেই তা জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও গতিশীল থাকে। অন্যদিকে এক যুগের লিখিত ভাষা অন্যযুগে আর অনুসৃত হয় না, মৃত ভাষায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরী ভাষার উদাহরণ দিয়েছেন। এখন আর কেউ ওই ভাষায় সাহিত্য রচনা করবে না। সুতরাং তাঁর মতে, কথ্যভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেই সাহিত্যের ভাষাকে অগ্রসর হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবি–ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রশ্নটি

উথাপন করে তিনি আর একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। তা হলো, বাংলাভাষী অঞ্চলের কথ্যভাষার রূপ এক-এক স্থানে এক-এক রকম। এর কোন রূপটি সাহিত্যে অনুসৃত হবে— সেটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। এক্ষেত্রে সকল প্রকার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন করলে তাতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, অন্য কিছু নয়। সেজন্য যে কোনো একটিকে মানসম্পন্ন ধরে নিয়ে সাহিত্যিককে তার অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু বাংলা ভাষার অধিকাংশ সাহিত্যিক পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাকে তাদের সাহিত্যের বাহন করছেন, তাছাড়া ওই কথ্যভাষাটি যেহেতু লিখিত ভাষার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সাদৃশ্যপূর্ণ, সুমার্জিত, শ্রুতিমধুর, সকলের নিকট সহজবোধ্য— যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাকে সমগ্র বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করার সুপারিশ করেন তিনি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, এস. ওয়াজেদ আলি 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' বিষয়ক যে প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন সেই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯২৮ সাল। তখনও সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি যে তাঁর মত পাল্টাতেন— তা নিঃসন্দেহে বলা যায়— তাঁর বাস্তববাদী মনোভঙ্গির কারণে। সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজ মতকে গড়ে তোলার সাহস তাঁর বরাবর ছিল। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯২৮ সালে যিনি সাহিত্যেআরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি, প্রদর্শন করেন, তিনিই ১৯৪৪ সালে লিখিত 'বাঙালী না মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে এর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারে বিরক্তিবোধ করেন। যেমন :

> আজকাল বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানী শব্দের আমদানী নিয়ে একটা হুজুক চলেছে। মুসলমানদের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দের আমদানীর যে প্রয়োজন আছে সে কথা কোন প্রেমিক বাঙালী মাত্রই স্বীকার করবেন। কিন্তু তা নিয়ে Perecntage কসতে যাওয়া বাতুলতা। যে শব্দ সুষ্ঠু এবং সহজবোধ্য তাই আনতে হবে। জোর করে অনাবশ্যক আরবী শব্দ আনবার দরকার নাই, আর সংস্কৃত শব্দ আনবারও দরকার নাই। যা সাধারণে বোঝে সেই সব শব্দ চালানই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত। আর নূতন শব্দ সম্পদের জন্য বাঙলার পল্লী মায়ের কাছে, আমাদের দেশের হাটে হাটে যাওয়াই ভাল। [বাঙালী না 'মুসমান']১৯

মূলত সাতটি প্রবন্ধে এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য ও শিল্পচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির নাম : *মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য* (১৯২৫), *জীবনের শিল্প* (১৯২৬), *বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা* (১৯২৫), *সাহিত্য* (১৯২৯), *বাঙালী না 'মুসলমান'* (১৯৪৪), *সাহিত্যের লক্ষ্য* (১৯৪৫) ও *সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা* । এসব প্রবন্ধে তিনি শিল্প-সাহিত্য কী, সাহিত্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী, সাহিত্যের উপকরণ কী, সাহিত্যের ভাষা হবে কীরূপ-এসকল

প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। এই মীমাংসায় তাঁর মানবকল্যাণ, জীবনের প্রতি অঙ্গীকার ও বাস্তবচেতনা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান ও গভীরতর সমাজজিজ্ঞাসা প্রভৃতি তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়ক হয়েছে। এর আর একটি কারণ নিজ পরিচয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ এখনও নিজ পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে দ্বিধায় ভোগে, এস. ওয়াজেদ আলি তা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। *বাঙালীনা 'মুসলমান'* শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "নিজ নিজ ধর্ম হিসাবে আমরা হিন্দু কিম্বা মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টান কিম্বা নাস্তিক হতে পারি বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা বিশ্বাসী, নাগরিক হিসাবে আমরা ভারতবাসী, আর জাতি হিসাবে আমরা বাঙালী।"[২০] আজও আমাদের মধ্যে 'বাঙালী' – 'বাংলাদেশী'র দ্বন্দ্ব ঘুচছে না অথচ ১৯৪৪ সালে এস. ওয়াজেদ আলি এসম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করে গেছেন। আর একারণেই তাঁর সাহিত্যচিন্তাও বিশেষ স্বচ্ছতা লাভ করেছে। এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যচিন্তা বিশ্লেষণ আজও যে প্রাসঙ্গিক তার কারণও ওই স্বচ্ছতা, দ্বিধাহীনতা ও ইতিবাচকতা।

তথ্যনির্দেশ

১ *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৫,

২ *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* , প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ১২০

৩ পূর্বোক্ত

৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৫ *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, সংগ্রহ ও সম্পাদনা: সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫০৫-৬

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৭

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮

৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০

১০ *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ, ১২

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ ৫১

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ ১৩২

১৯ *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০